এপ্রিল - জুন ২০১৫

ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

৪র্থ পর্ব, ২য় সংখ্যা

- বিশেষ প্রবন্ধ
- জরুরী চিকিৎসা
- রোগ ও চিকিৎসা
- স্বাস্থ্যকথা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৬
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য	৭
জরুরী চিকিৎসা	৮
রোগ ও জিজ্ঞাসা	১০
রোগ ও চিকিৎসা	১১
ইনফো কুইজ	১৪
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরি
ডাঃ শায়লা শারমিন

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

ইনফো মেডিকাস এর প্রতি আপনাদের নিয়মিত সমর্থন, মূল্যবান মন্তব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামতের জন্য এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারের সংখ্যায় আলোচিত সাধারণ কিছু রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এই সংখ্যার তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে।

নিউমোনিয়া একটি পরিচিত রোগ যা সকল বয়সের মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের। তাই এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে নিউমোনিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছবি দেখে রোগ নির্ণয় বিভাগে বরাবরের মতো এবারও কিছু শিক্ষণীয় ছবি সংযোজন করা হয়েছে যা আপনারদের প্রতিনিয়ত চিকিৎসা সেবা দানে সহায়তা করবে। জরুরী চিকিৎসা বিভাগে চোখ উঠা এবং ফ্রোজেন শোল্ডার এই দুইটি বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে কি কি করনীয়, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

গর্ভকালীন সময়ে মায়েরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগেন। আমাদের দেশের পরিপেক্ষিতে এটি খুবই পরিচিত সমস্যা। তাই রোগ ও চিকিৎসা বিভাগে গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে আমাদের সাথে আপনাদের এই বন্ধন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি রইল শুভকামনা।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া হলো ফুসফুসের প্রদাহজনিত একটি রোগ। সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক সংক্রমণের কারণে নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া মৃদু বা হাল্কা থেকে তীব্র হতে পারে। নিউমোনিয়ার ফলে ফ্লু হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

প্রকারভেদ

নিউমোনিয়ার কারণের উপর ভিত্তি করে নিউমোনিয়াকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- কমিউনিটি একুয়ার্ড নিউমোনিয়া (Community acquired pneumonia)
- হসপিটাল একুয়ার্ড নিউমোনিয়া (Hospital acquired pneumonia)
- এ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া (Aspiration pneumonia)

লক্ষণ ও উপসর্গ

নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এটা নির্ভর করে কি ধরণের জীবাণু দিয়ে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ হয়েছে তার উপর। নিউমোনিয়া হলে সাধারণত যেসব লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো-

- জ্বর
- কাশি
- শ্বাস কষ্ট
- ঘাম হওয়া
- কাঁপুনি
- বুকে ব্যাথা
- বুক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে উঠা নামা করা
- মাথা ব্যথা
- মাংসপেশীতে ব্যাথা
- ক্লান্তি অনুভব করা

কারণ

- ব্যাকটেরিয়া-নিউমোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস
- ভাইরাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা
- আদ্যপ্রানী-এন্টামিবা হিষ্টোলাইটিকা
- ছত্রাক-এক্টিনোমাইকোসিস
- কেমিক্যাল
- হঠাৎ ঠান্ডায় উন্মুক্ত হওয়া
- অপারেশনের পরর্বতী সময়

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

- শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা
- বুকের এক্সরে
- রক্ত এবং কফ বা শ্লেষ্মা (Mucus) পরীক্ষা

চিকিৎসা

নিউমোনিয়া একটি জটিল রোগ। এই রোগের চিকিৎসা সাধারণত ঔষধ সেবনের মাধ্যমে করা হয়। নিম্নে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা আলোচনা করা হলোঃ

- এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবন করা
- ভাইরাস প্রতিরোধী ঔষধ সেবন করা
- পর্যাপ্ত পরিমান বিশ্রাম নেওয়া
- তরল খাদ্য গ্রহণ করা
- জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য ঔষধ সেবন করা

নিউমোনিয়া কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়

- ভালোভাবে পরিস্কার করে হাত ধোয়া
- নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া
- সুষম খাদ্য গ্রহণ করা
- ধূমপান পরিহার করা
- অন্যের সামনে হাঁচি কাশি দেয়া থেকে বিরত থাকা। হাঁচি কাশি দেয়ার সময় মুখ হাত দিয়ে ঢাকা বা রুমাল ব্যবহার করা
- নিউমোকক্কাল টিকা দিয়ে নিউমোনিয়া রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব

জটিলতা

বাংলাদেশে নিউমোনিয়ার প্রধান কারণ হল 'স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি' জীবাণুর সংক্রমণ। শুধু নিউমোনিয়া নয়, এটি এদেশে ব্যাকটেরিয়া জনিত মেনিনজাইটিস ও সেপটিসেমিয়ারও প্রধান কারণ। বাংলাদেশ পৃথিবীর দশটি দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে 'স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি' জনীত মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রতি বছর এখানে প্রতি এক লক্ষ শিশুর মধ্যে একুশ হাজার শিশু এই সংক্রমণে মারা যায়। জীবাণু যে শুধু শ্বাসযন্ত্রে থাকবে তা নয়। সুযোগ পেলেই তা রক্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তখন তাকে বলে 'ব্যাকটেরিমিয়া'। পরবর্তীতে রক্ত থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে বিভিন্ন অঙ্গে যেমন হৃদপিন্ড, মস্তিস্ক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ রোগের জটিলতা সারা দেহ জুড়ে এবং এতে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রচুর।

নিউমোনিয়ার ফলে নিচের জটিলতাগুলো দেখা দিতে পারেঃ

- রক্তপ্রবাহে (Blood stream) জীবাণুর সংক্রমণ
- ফুসফুসের চারপাশে তরল জমা এবং সংক্রমণ (Fluid accumulation and infection around lungs)
- লাং এ্যাবসেস (Lung abscess)
- তীব্র শ্বাসকষ্ট বা একিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম (Acute respiratory distress syndrome)

শিশুদের নিউমোনিয়া

বাংলাদেশে শিশুদের জন্য নিউমোনিয়া একটি আতঙ্কের নাম। প্রতি বছর এদেশে অনেক শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকে মারাও যায়। বিশেষ করে যেসব শিশুর বয়স ৫ বছরের নীচে, তাদের মধ্যে এই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী। তবে একটু সতর্ক হলেই কিন্তু এই ভয়ানক বিপদজনক অসুখ থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখা যায় কিংবা তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচানো যায়। শিশুদের নিউমোনিয়া থেকে নিরাপদ রাখতে মায়েদের একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে শীতকালে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। তাই শীতকাল এলে মায়েদের নিজ নিজ বাচ্চাদের দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে। সহজে যেন তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

শিশুদের নিউমোনিয়ার প্রকারভেদ

ক) ২ মাসের কম বয়সী শিশুদের নিউমোনিয়া

- খুব মারাত্বক নিউমোনিয়া
- নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি

খ) ২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের নিউমোনিয়া

- খুব মারাত্বক নিউমোনিয়া
- নিউমোনিয়া
- নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি

লক্ষণ

খুব মারাত্বক নিউমোনিয়া (২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)

- বুকের দুধ খেতে পারবে না
- খিঁচুনি হতে পারে
- নেতিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে পরতে পারে
- জ্বর, সাথে কাশি থাকতেও পারে
- দ্রুত শ্বাস নিবে (প্রতি মিনিটে ৫০ বা তার বেশি)
- শ্বাস নেয়ার সময় সাঁ সাঁ শব্দ করবে
- শ্বাস নেয়ার সময় বুক ভিতরে দেবে যেতে পারে
- হাত ও পায়ের আঙ্গুল নীল হয়ে যেতে পারে

নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি (২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)

- সর্দি কাশি থাকবে
- অন্যান্য লক্ষণগুলো থাকবে না

খুব মারাত্মক নিউমোনিয়া (২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)

- নেতিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে পরতে পারে
- বুকের দুধ খেতে পারবে না
- কিছু খেলে বমি করে ফেলে দিতে পারে
- খিঁচুনি হতে পারে
- শ্বাস নেয়ার সময় বুক ভিতরে দেবে যেতে পারে
- শ্বাস নেয়ার সময় সাঁ সাঁ শব্দ করবে
- জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট থাকবে
- কানের লতি, নাকের ডগা, জিহ্বার অগ্রভাগ, ঠোঁট নীল হয়ে যেতে পারে
- শিশু মারাত্বক অপুষ্টিতে ভুগতে পারে

নিউমোনিয়া (২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)

- দ্রুত শ্বাস নিবে (২ মাস থেকে ১২ মাস বয়সী শিশুরা প্রতি মিনিটে ৫০ বা তার বেশি বার শ্বাস নিবে এবং ১২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরা প্রতি মিনিটে ৪০ বা তার বেশি বার শ্বাস নিবে)

- জ্বর ও কাশি থাকবে
- শ্বাস নেয়ার সময় বুক ভিতরে দেবে যাবে না

নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি (২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে)

- জ্বর, সর্দি কাশি থাকবে
- অন্যান্য লক্ষণগুলো থাকবে না

নিউমোকক্কাল টিকা

নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবহার এখন বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ভ্যাকসিন ব্যবহারে শিশুদের নিউমোনিয়া কমে যায়। নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনগুলো হচ্ছে হিব ভ্যাকসিন ও নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। হিব ভ্যাকসিন দেড় মাস বয়সেই নিতে হয়। দেড় মাস বয়স থেকে সরকারি যে টিকা দেওয়া হয় সেটি Penta Valent Vaccine নামে পরিচিত। এই ভ্যাকসিনে একই সঙ্গে পাঁচটি রোগের টিকা বিদ্যমান। এটা যদি নেওয়া হয়, তাহলে তার কিছু দিন পর থেকে হিবজনিত নিউমোনিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া মারাত্মক একটি রোগ। তাই নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন দিয়ে এটা প্রতিরোধ করা ভালো। এ ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সের আগে নিলে তিনটি ডোজ লাগবে। ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে নিলে দুইটি ডোজ লাগবে। আর এক বছর পরে নিলে একটি ডোজ লাগবে। আর মিজেলস বা রুবেলা ভ্যাকসিনও যদি কেউ নিয়ে থাকে, এটাও কিন্তু পরোক্ষভাবে নিউমোনিয়ার হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

চিকিৎসা

খুব মারাত্মক নিউমোনিয়া

- জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে পাঠাতে হবে
- হাসপাতালে যাবার পথে শিশুকে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়ে যেতে হবে

নিউমোনিয়া

- এন্টিবায়োটিক দিতে হবে
- বাড়িতে যত্ন নেয়ার ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিতে হবে
- ২ দিন পর পুনরায় শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে দেখাতে হবে

নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি

- বাড়িতে যত্ন নেয়ার ব্যাপারে মাকে পরামর্শ দিতে হবে

বাড়ীতে শিশুর যত্ন

- অসুস্থ অবস্থায় শিশুর স্বাভাবিক খাবার চালু রাখতে মাকে পরামর্শ দিতে হবে
- শিশু যদি মায়ের বুকের দুধ খায়, তবে ঘন ঘন তা খাওয়াতে হবে
- ৬ মাসের বেশি বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য তরল খাবার, যা শিশু খেতে পারে তা খাওয়াতে বলতে হবে
- কাশি উপশমের জন্য ৬ মাসের বেশি বয়সের শিশুদের হাল্কা গরম চিনি পানি, আদা, লেবুর শরবত, তুলসি পাতার রস ইত্যাদি খাওয়ানোর পরামর্শ দিতে হবে
- অসুস্থ শিশুর নাক বন্ধ থাকলে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করার পরামর্শ দিতে হবে
- ৫ দিন এর মধ্যে না কমলে শিশুকে হাসপাতালে আসতে বলতে হবে

কিছু সাধারণ জিজ্ঞাসা

প্রশ্নঃ নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া কাকে বলে?

উত্তরঃ 'স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি' নামের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত নিউমোনিয়ার নাম 'নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া'। দুই বছরের কম বয়সী শিশুরা এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। বাহক অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। বাহক হল সেই শিশু বা ব্যক্তি যে নিজে রোগাক্রান্ত না হয়েও তার দেহে ঐ রোগের জীবাণু থাকার কারণে রোগ ছড়াতে পারে। আর বলা বাহুল্য, আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশুর দেহে তো ঐ রোগের জীবাণু রয়েছেই। নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া রোগের বাহকের শ্বাসনালীর উর্ধ্বভাগে এ রোগের জীবাণু বাসা বেঁধে থাকে। সুতরাং বাহক অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশি এমনকি শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কাছে অবস্থানরত মানুষেরা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে।

প্রশ্নঃ কাদের নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে?

উত্তরঃ যাদের নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা হলেন-

- ছোট্ট শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা
- বহুদিন ধরে ভুগছে এমন কোন রোগ থাকলে যেমনঃ বহুমূত্র (Diabetes), হৃদরোগ, ফুসফুসের অন্য কোন রোগ, এইডস ইত্যাদি থাকলে
- যাদের অন্য কোন কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে যেমনঃ- ক্যানসারের চিকিৎসা নিলে, স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ সেবন করলে
- যারা ধূমপান করেন

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

অ্যাঙ্কাইলোগ্লোসিয়া

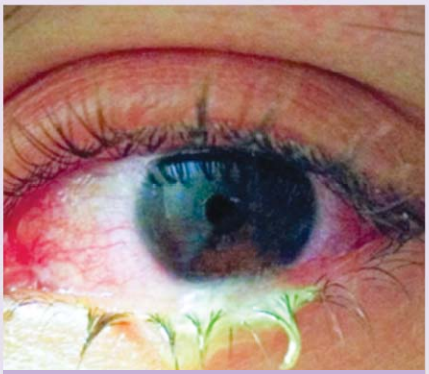
কনজাংটিভাইটিস

ঠোঁটের স্কোয়ামাস সেল ক্যানসার

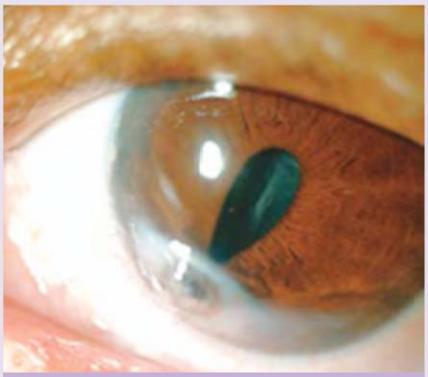
কর্নিয়ার পারফোরেসন

এনজিওইডিমা

অরাল ম্যাক্সিলারি ফিস্টুলা

টিনিয়াসিস

ডার্মাটাইটিস

নিউরোফাইব্রোমেটোসিস

দাঁতের সাইনাস ট্রাক্ট

হারপিস প্রদাহ

ওয়ারটস্

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

কবজিবন্ধনীতে ধরা পড়বে ক্যানসার

মানুষের কৃত্রিম ত্বক তৈরি করেছে গুগল। আগেভাগেই বিভিন্ন রোগ শনাক্ত করতে পারে, এমন কবজিবন্ধনী তৈরির জন্য একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ওই ত্বক বানানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে যেসব রোগ শনাক্ত করা যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে ক্যানসার ও হৃদরোগ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত গুগল এক্স গবেষণাগারের প্রাণবিজ্ঞান বিভাগে চলছে ওই কৃত্রিম ত্বক তৈরির কাজ। তবে কাজটা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

ক্যানসার কোষগুলো প্রথমবারের মতো দৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোকে এই পদ্ধতিতে শনাক্ত করা যাবে। দেহে কোনো রোগ আছে কি না, তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার সাহায্যে খোঁজ করবে এই কবজিবন্ধনী। ক্যানসারের মতো রোগের লক্ষণগুলো শরীরে দৃশ্যমান হতে বেশ সময় লেগে যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে লক্ষণগুলো দৃশ্যমান হওয়ার অনেক আগেই রোগ শনাক্ত করে দেবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রথম কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় স্থাপন

অস্ট্রেলিয়ার একটি শিশুর শরীরে এমন একটি যন্ত্র যুক্ত করা হয়েছে, যা কৃত্রিম অগ্ন্যাশয়ের মতো কাজ করবে। চার বছর বয়সী ওই শিশুর নাম জাভিয়ের হেমস। বিশ্বে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের মোকাবিলায় এ ধরনের চিকিৎসা এটিই প্রথম বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন।

কৃত্রিম অগ্ন্যাশয় বা ইনসুলিন পাম্প নামে পরিচিত যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা এমপিথ্রি প্লেয়ারের মতো। এটি শিশুটির শরীরে যুক্ত করার জন্য তার ত্বকের নিচে বেশ কয়েকটি নল স্থাপন করতে হয়েছে। এটি ইনসুলিন সরবরাহ ব্যবস্থা হিসেবে ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে কাজ করবে। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ অগ্ন্যাশয়ের প্রাকৃতিক কার্যক্রমের অনুকরণে এই প্রযুক্তিটি তৈরি করেছে। এটি রক্তে চিনির মাত্রা কমানো এবং ইনসুলিন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। ফলে শর্করার স্বল্পমাত্রার কারণে কোমা, আকস্মিক অসুস্থতা ও মৃত্যুর মতো মারাত্বক পরিণতি এড়ানো সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তি মানুষের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পর্যবেক্ষণে রাখে এবং সম্ভাব্য আকস্মিক অসুস্থতার (হাইপোগ্লাইকেমিক) অন্তত ৩০ মিনিট আগেই ইনসুলিন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গর্ভথলিসহ জন্ম নিল শিশু

চিকিৎসকদের তাজ্জব করে দিয়ে গর্ভথলিসহ জন্ম নিয়েছে একটি শিশু। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সিদার্স সিনাই মেডিকেল সেন্টারে প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন শিশুটির মা চেলসি। চিকিৎসকরা দেখলেন, নির্দিষ্ট সময়ের তিন মাস আগেই চেলসির প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। সিদ্ধান্ত হলো অস্ত্রোপচার করার। শিশুটির অস্ত্রোপচারকারী ডা. উইলিয়াম বিন্দার বলেন, 'শিশুটির গর্ভথলি অক্ষত দেখে আমরা তো অবাক'। শিশুটির ছোট হাত পা মাথা সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গর্ভফুল আর নাভিরজ্জুর সঙ্গে যুক্ত থেকে বাঁকা হয়ে যেন ঘুমুচ্ছে। অর্থাৎ গর্ভে শিশুটি ঠিক মতোই বেড়ে উঠেছে কিন্তু তার গর্ভথলি তখনও অক্ষত। অলৌকিক শিশুটির নাম রাখা হয়েছে সিলাস ফিলিপ। জন্মের পর শিশুটি সুস্থ আছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশুটিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে। এটি একটি বিরল ঘটনা।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চোখ ওঠা

চোখের সাদা অংশের উপরে ও পাতার নীচে যে ঝিল্লির মত পাতলা পর্দা থাকে তাকে কনজাংটিভা বলে।

কনজাংটিভার প্রদাহকে কনজাংটিভাইটিস বা চোখ উঠা বলে। প্রদাহের কারণে কনজাংটিভার রক্তনালীগুলো ফুলে যায়। যার ফলে রক্তপ্রবাহ বেরে যায়, এই জন্যই চোখ উঠলে চোখ লাল দেখায়। এটা জীবাণুর আক্রমণ, এলার্জিসহ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। ছোট বড় সকলেই কনজাংটিভাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্রকারভেদ

- ভাইরাসজনিত কারণে চোখ উঠা
- ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে চোখ উঠা
- অ্যালার্জিজনিত কারণে চোখ উঠা

কারণ

সাধারণভাবে ভাইরাসের কারণেই চোখ ওঠা রোগটি বেশী দেখা যায়। ভাইরাসের কারণে যে চোখ ওঠা দেখা দেয় তা প্রচন্ড ভাবে সংক্রামক হয়ে থাকে। কখনো কখনো রোগটি ব্যাকটেরিয়া, অ্যালার্জি কিংবা কেমিক্যালের কারণেও হতে পারে। এটা এক ধরনের ছোঁয়াচে রোগ। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির ধরা বস্তু ও পানির মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে। স্কুল কলেজ থেকে এই রোগ ছড়াতে পারে।

লক্ষণ

- চোখ জ্বলবে, চোখের ভেতর অস্বস্থি বোধ হবে এবং সামান্য ব্যথা অনুভূত হতে পারে
- রোদে বা আলোতে তাকাতে কষ্ট হবে ও অতিমাত্রায় পানি পড়বে
- চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠে
- ঘুম থেকে উঠার পর চোখের পাতা দুটি একত্রে লেগে থাকে
- চোখ থেকে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ বের হতে থাকে ও হলুদ রঙের পুঁজ সৃষ্টি হয়
- চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়
- মণি বা কর্নিয়াতে সাদা দাগ পড়ে যায় যা খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না

সবগুলো উপসর্গ রোগীর ক্ষেত্রে একসাথে দেখা নাও যেতে পারে। সাধারণত ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে উপসর্গগুলো কমে আসে।

চিকিৎসা

চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস প্রথমে এক চোখে হয়, এরপর তা অন্য চোখে ছড়িয়ে পরে। এজন্য অন্য চোখটিকে সংক্রমিত হতে না দেয়া চিকিৎসার একটি উদ্দেশ্য। এজন্য রোগীকে অসুস্থ চোখের পাশে কাত হয়ে শুতে বলা হয়। এছাড়া চোখে বার বার হাত না দেয়া, বার বার পানি দিয়ে না ধোয়া, কালো চশমা পড়া ইত্যাদি উপদেশ রোগটির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে।

- **ভাইরাসজনিত কারণে চোখ উঠলেঃ** এটির নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। এ ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানি এবং কৃত্রিম চোখের পানি দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- **ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে চোখ উঠলেঃ** কোনো ধরনের চিকিৎসা ছাড়াই এটি ভালো হয়ে যায়। আর যদি রোগটি তিন দিনের বেশি স্থায়ী হয় তখন অ্যান্টিবায়োটিক চোখের ড্রপ অথবা মলম ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **অ্যালার্জিজনিত কারণে চোখ উঠলেঃ** প্রধান চিকিৎসা হলো চোখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে। এবং এ ক্ষেত্রে কখনো কখনো নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ওষুধ অথবা অ্যান্টি হিস্টামিন দেওয়া যেতে পারে।

সতর্কতা

যেসব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা হলো- ধুলাবালি, আগুন, আলো, রোদে কম যাওয়া, ময়লা আবর্জনাযুক্ত স্যাতসেঁতে জায়গায় না যাওয়া, পুকুর বা নদী নালায় গোসল না করা, চোখে কালো চশমা ব্যবহার করা। সম্ভব হলে ১০ থেকে ১৫ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়া।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ফ্রোজেন শোল্ডার

ফ্রোজেন শোল্ডার বা শোল্ডার জয়েন্ট এ ব্যথা বয়স্ক মানুষের খুব পরিচিত একটি সমস্যা। এটি হলে ঘাড়ের জয়েন্ট শক্ত হয়ে যায়। এটি ঘাড়ের জয়েন্টের প্রদাহজনিত একটি অসুখ। এ ক্ষেত্রে জয়েন্টের মধ্যকার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নামক এক ধরনের তরল পদার্থ কমে যেতে থাকে। ফলে শোল্ডার জয়েন্ট ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়। ফ্রোজেন শোল্ডারকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় শোল্ডার অ্যাডহেসিভ ক্যাপসুলাইটিস বলা হয়। সাধারণত যাঁদের বয়স ৪০ থেকে ৬০ এর ভেতর তাদের ফ্রোজেন শোল্ডার হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ এই বয়সে মাংসপেশী খানিকটা ঢিলে হয়ে যায়। তাই জয়েন্টের উপর তার প্রভাব পড়ে। তবে কমবয়সীদেরও এটা হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের এটা বেশি হয়।

কারণ

ফ্রোজেন শোল্ডার কেন হয় তার কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ হবার আশংকা বেশী থাকে। আর তা হল ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ঘাড়ের জয়েন্টে আঘাত পেলে, কোনো কারণে জয়েন্ট অনেকদিন নাড়ানো না হলে, ফুসফুস, হৃদপিন্ডের বা হাতের অপারেশনের পরে, থাইরয়েডের সমস্যা ইত্যাদি কারণে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ

ফ্রোজেন শোল্ডার হলে শোল্ডার জয়েন্ট এ ব্যথা হওয়াটাই মূল উপসর্গ। এছাড়াও যে লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো হলোঃ

- সব সময় কাঁধে ব্যথা থাকে রাতে বেশি হয় এবং শীতকালে ব্যথা বেড়ে যায়
- ঘাড়ের জয়েন্টে ব্যথা
- জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া
- জয়েন্ট নাড়ানোর ক্ষমতা কমে যাওয়া
- পাশ ফিরে শুতে না পারা
- প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দিতে না পারা
- জামা পরিধান বা বোতাম লাগাতে কষ্ট হওয়া
- চুল আচরাতে না পারা
- কাঁধ বা বাহুর মুভমেন্ট সবদিকে সীমিত হয়ে যাওয়া
- হাত দিয়ে কোন কিছু তোলা বা হাত উপরে উঠাতে না পারা

চিকিৎসা

ফ্রোজেন শোল্ডার রোগীর কাছে ব্যথা প্রধান সমস্যা মনে হলেও, তার আসল সমস্যা হলো জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া। রোগী যত ব্যথার ভয় করে হাত নাড়ানো বন্ধ রাখবে, তার জয়েন্ট তত বেশি শক্ত হয়ে যাবে। তাই রোগীকে বুঝাতে হবে, ব্যথার ঔষধের চেয়ে হাত নাড়ানোর চিকিৎসা করা বেশি জরুরী। এ ক্ষেত্রে রোগীর ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রেখে হাত নাড়ানোর ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি হলো সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা। ফ্রোজেন শোল্ডার সমস্যাটি ১ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, এরপর নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। তাই অনেক সময়ই এর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কোনো কারণে যদি হাত একদম জমে যায় এবং বছর তিনেক পরেও সমস্যার কোনো উন্নতি না হয় তাহলে অপারশনের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থোপেডিক সার্জন বা হাড় ও সন্ধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসা করে থাকেন।

ব্যায়ামবিধি

ফ্রোজেন শোল্ডার ব্যায়াম বাসায় করা যায়। এসব ব্যায়ামের মধ্যে একটি হলো পেন্ডুলাম এক্সারসাইজ। এটি করার নিয়ম হলো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাত যতটা ঘোরাতে পারা যায়, সামনে পেছনে করে ততটাই ঘোরাতে চেষ্টা করতে হবে। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, প্রথমে সেদিকে ১০ বার হাত ঘোরাতে হবে। এরপর ঠিক এর বিপরীত দিকে হাত ঘোরাতে হবে আরও ১০ বার। এভাবে দিনে দুই বার করে ব্যায়ামটি করতে হবে। দুই সপ্তাহ পর এটির পরিবর্তে করতে হবে ওয়েট বিয়ারিং এক্সারসাইজ। হাতে কিছুটা ওজন নিয়ে হাত ঘোরানোর এই ব্যায়ামটি শুরু করতে হবে। পেন্ডুলাম এক্সারসাইজের নিয়মেই করতে হবে এই ব্যায়াম। ঘড়ির কাঁটার দিকে ১০ বার এবং তার বিপরীত দিকে ১০ বার করে হাত ঘুরিয়ে করতে হবে এই ব্যায়ামটিও। দিনে দুই বার করে ব্যায়ামটি করতে হবে।

পেন্ডুলাম এক্সারসাইজের পাশাপাশি করা যাবে ওয়াল ক্লাইম্বিং এক্সারসাইজ। এই ব্যায়াম করতে রোগী যতটা হাত ওঠাতে পারে, একটি দেয়াল ধরে দেয়ালটি বরাবর ঠিক ততটা উচ্চতায় হাত উঠাতে হবে তাঁকে। ধীরে ধীরে অধিক উচ্চতায় হাত ওঠাতে চেষ্টা করতে হবে। সব ব্যায়ামকেই একসঙ্গে শোল্ডার মোবিলাইজিং ব্যায়াম বলা হয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রশ্নঃ জরায়ুতে টিউমার হলে কি সন্তান ধারণে কোনো সমস্যা হতে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, জরায়ুতে টিউমারের জন্য সন্তান ধারণে সমস্যা বা বারবার গর্ভপাত বা বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। ৩০-৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে জরায়ুতে টিউমারের জন্য বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। টিউমারের কারণে জরায়ু অতিরিক্ত বড় হয়ে গেলে, ভেতরে কোনো কারণে ভ্রূণ ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারে না, জরায়ু ও ফেলোপিয়ান টিউবের সংযোগস্থলে বা এমন জায়গায় টিউমারটির অবস্থান হয়, যা ভ্রূণকে সুস্থিত হতে বাধা দেয়। এসব ক্ষেত্রে বারবার গর্ভপাত ঘটে বা বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সন্তান নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ উচ্চ রক্তচাপ কি বেশি বয়সের অসুখ, অর্থাৎ শুধু বয়স্ক ব্যক্তিরাই কি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন?

উত্তরঃ ধারণাটি মোটেই সঠিক নয়। যেকোনো বয়সের নর নারীই জীবনের যেকোনো সময়ে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে বিভিন্ন কারণে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের নর নারীর উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। যেমন: অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত ওজন, কিডনি সমস্যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। তাই নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত এবং সতর্ক থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ স্তন্যপানরত শিশুদেরও কি ঠান্ডা কাশিতে মধু, লেবু বা তুলসী পাতার রস খাওয়ানো যাবে?

উত্তরঃ শিশুদের কাশি প্রশমনের জন্য মধু বা লেবুর রস বা তুলসী পাতার রস বুকের দুধের সঙ্গে খাওয়ানো যেতে পারে। এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং শিশু খানিকটা আরাম পেতে পারে। তবে বাসক পাতার রসে তেমন উপকার হয় না এবং এর তিতকুটে স্বাদে শিশু বিরক্ত হতে পারে।

প্রশ্নঃ শিশুদের প্যারাসিটামল মুখে খাবার সিরাপ ও পায়ুপথে ব্যবহারের সাপোজিটরির মধ্যে কার্যকারিতার পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ নেই। দুটোই একই উপাদান, অর্থাৎ এসিটামিনোফেন দিয়ে তৈরি। কেবল দেহে প্রবেশের পথটি আলাদা। অনেকের ধারণা, সাপোজিটরি সিরাপের চেয়ে বেশি কার্যকর। জ্বর বেশি হলে সিরাপ না দিয়ে সাপোজিটরি দেওয়া উচিত। কিন্তু আসলে কার্যকারিতা বা নিরাপত্তার দিক দিয়ে সিরাপ বা সাপোজিটরি একই ধরনের। তবে কোনো শিশু যদি বারবার বমি করে ওষুধ ফেলে দেয় বা গিলতে না পারে, সে ক্ষেত্রে মুখে খাবার সিরাপের বদলে সাপোজিটরি ব্যবহার করাই শ্রেয়।

প্রশ্নঃ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় কি জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়া যাবে?

উত্তরঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে বুকের দুধের পরিমাণ কমে যেতে পারে, এ ছাড়া শিশুর ওপর অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তাই প্রথম ছয় মাস যখন শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে বলা হয়, সে সময় বড়ি না খেয়ে অন্য কোনো পদ্ধতি, যেমন কনডম ব্যবহার করা যায়। ছয় মাস পর যখন অন্য খাবার শিশুকে দেওয়া হবে, তখন বড়ি শুরু করা যেতে পারে। তার পরও প্রথম থেকেই কেবল প্রজেস্টেরন আছে এমন মিনিপিল খেতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্নঃ অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে কি মানসিক রোগের সম্পর্ক থাকতে পারে?

উত্তরঃ অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে মানসিক রোগের সম্পর্ক থাকতে পারে। কেননা বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারে রোগী বেশি খেতে চায়। অনেক সময় বিষণ্নতায় আক্রান্ত রোগীরাও খেয়ে ফেলে বেশি। এ ছাড়া কিছু খাদ্য গ্রহণজনিত আচরণগত সমস্যা আছে, যা রোগীকে অতিরিক্ত খেতে বাধ্য করে। কেবল রোগ নয়, মানসিক রোগের কারণে যেসব ওষুধ দেওয়া হয়, তার কোনোটির প্রতিক্রিয়ায়ও রোগী বেশি খেতে পারে। কারও মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলার অভ্যাস ও অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানসিক কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

গর্ভকালীন সমস্যা

প্রতি বছর গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতায় আমাদের দেশের বহু নারীর মৃত্যু হয়। গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাবে মা ও শিশু উভয়ের জীবনই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। গর্ভকালীন সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা ও সঠিক পরিচর্যাই পারে মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে। তাই এ ধরনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এ থেকে নিরাপদ থাকার কিছু পরামর্শ দেয়া হলো। গর্ভকালীন প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছেঃ

- প্রি-এক্লাম্পশিয়া
- এক্লাম্পশিয়া
- গর্ভকালীন সময়ে গ্যাসের সমস্যা
- গর্ভপাত
- গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

প্রি-একলাম্পশিয়া

প্রি-একলাম্পশিয়া গর্ভধারণের ২০ সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ মাস পর থেকে দেখা দেয় যেখানে গর্ভবতী মায়ের রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন (আমিষ) জাতীয় পদার্থ শরীর থেকে বের হয়।

লক্ষণ

- রক্তচাপ সাধারণত ১৪০/৯০ মিলিমিটার অব মারকারী এর বেশি থাকবে
- প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন (আমিষ) জাতীয় পদার্থ শরীর থেকে বের হবে
- হাত পায়ে পানি আসতে পারে
- মাথা ব্যথা, চোখে চাপসা দেখা ও বমি হতে পারে
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে
- প্রি-একলাম্পসিয়া হওয়ার শুরুতেই শরীরে ওজন বাড়তে থাকে, সপ্তাহে আধা কেজি ওজন বৃদ্ধি পায়

কারণ

- পরিবারে কারো প্রি-একলাম্পশিয়া হলে
- পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলে
- যাঁরা বেশি বয়সে মা হন তাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং নেফ্রাইটিস রোগীদের

চিকিৎসা

- প্রি-একলাম্পশিয়া আক্রান্ত রোগীকে নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে
- খাবারের সঙ্গে আলাদা লবণ খাওয়া বন্ধ করতে হবে
- প্রোটিন এবং ক্যালোরি যুক্ত খাবার খেতে হবে
- রাতে গড়ে ৮ ঘণ্টা এবং দিনে ২ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে
- পা ফুলে গেলে পা দুটো বালিশের উপর উঁচু করে রেখে ঘুমাতে হবে
- নিয়ম অনুযায়ী ঘুমের ওষুধ এবং উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খেতে হবে
- রক্তচাপ, ওজনের চার্ট তৈরি করতে হবে
- প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন যাচ্ছে কি না তার চার্ট করতে হবে

এক্লাম্পশিয়া

গর্ভবতী মায়েদের যখন খিঁচুনি দেখা যায় তখন তাকে এক্লাম্পশিয়া বলে। সাধারণত গর্ভধারণের ৬ মাস পর অথবা প্রসবের সময় অথবা প্রসবের কিছু সময় পর এটি হয়ে থাকে।

কারণ

- প্রি-এক্লাম্পশিয়া রোগীর চিকিৎসা না হলে
- গর্ভবতী মায়ের সঠিক পরিচর্যা ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করলে

চিকিৎসা

- রোগীকে একটি আলাদা ঘরে বাম কাত হয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে
- রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে পাঠাতে হবে, না হলে গর্ভবর্তী মা ও শিশু উভয়ের মৃত্যু অনিবার্য

প্রতিরোধ

- গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত প্রসবপূর্ব চেক আপের ব্যবস্থা করতে হবে
- গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার ও বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে

- প্রসবপূর্ব চেক আপের সময় শারীরিক ওজন ও রক্তচাপ, পায়ে পানি আসে কিনা, প্রস্রাবে এলবুমিন যায় কিনা এগুলো পরীক্ষা করা উচিত

- গর্ভাবস্থায় প্রি-এক্লাম্পশিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা করা। প্রি-এক্লাম্পশিয়া প্রতিরোধ করা সহজ কিন্তু এক্লাম্পশিয়া হলে রোগীর ও বাচ্চার জীবন রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে

গর্ভকালীন সময়ে গ্যাসের সমস্যা

গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হলো গ্যাসের সমস্যা। এটি যেকোন সময়, যেকোন মানুষের জন্যই অনেক বেশি অস্বস্তির হতে পারে। আর গর্ভকালীন সময়ে ব্যাপারটি আরো বেশি করে ঘটে থাকে বলে মা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগে থাকেন।

কারণ

গর্ভকালীন সময়ে সাধারণত যেসব কারণে গ্যাসের সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হলোঃ

- শরীরের বাড়তি হরমোন, বিশেষত প্রজেস্টেরন বা রিলাক্সিন নামক হরমোনগুলো এর জন্য বেশি দায়ী
- খাবারের অনিয়ম বা মর্নিং সিকনেস
- গর্ভাবস্থায় হজমের সমস্যা
- কিছু বিশেষ খাবার যেমন- আপেল, শিমের বিচি, ব্রোকলি, বাধাকপি, ফুলকপি, দুধ বা পনির, পেঁয়াজ, নাশপাতি ইত্যাদি

চিকিৎসা

- নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রতিদিন খেতে হবে। কোনভাবেই খাবারে অনিয়ম করা যাবে না
- একটু পর পর অল্প অল্প করে খেতে হবে। খাবার খাওয়ার সময় তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ চিবিয়ে খেতে হবে যাতে হজমে সমস্যা না হয়
- খাবার খাওয়ার পরে বেশি করে পানি পান করতে হবে
- কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস পরিহার করতে হবে
- এই সময় টাইট ফিটিং সব কাপড়চোপড় পড়া এড়িয়ে চলতে হবে
- কৃত্রিম রঙ এবং চিনিযুক্ত প্যাকেটজাত খাবার পরিহার করতে হবে
- প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে নিয়ম করে
- পুদিনা পাতা দিয়ে চা খেলে এই সমস্যা থেকে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায়
- কিছু কিছু খাবার রয়েছে যা মায়ের গ্যাসের সমস্যা আরো বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে এসব খাবার পরিহার করা উচিৎ

গর্ভপাত

যদি কোনো কারণে গর্ভস্থ ভ্রূণ আটাশ সপ্তাহ বা সাত মাসের পূর্বে জরায়ু থেকে বের হয়ে যায় তবে তাকে গর্ভপাত বা এ্যাবরশন বলে।

কারণ

গর্ভপাতের কারণগুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. ভ্রূণের অস্বাভাবিকতা বা ক্রোমোজমের ত্রুটি

২. গর্ভবতী মায়ের শরীরের নানা ত্রুটির জন্য গর্ভপাতের আশংকা থাকে। যেমন-

- গর্ভবতীর যদি গর্ভাবস্থায় খুব জ্বর হয় এবং তাপমাত্রা ১০২° ফারেনহাইটের ওপরে উঠে যায়
- গর্ভবতীর যদি গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ বেড়ে যায়
- গর্ভবতীর যদি ডায়াবেটিস থাকে এবং তা যদি পূর্বে শনাক্ত করা না হয়ে থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত থাকে
- গর্ভবতীর যদি কিডনীর অসুখ (নেফ্রোটিক সিনড্রোম) থাকে
- গর্ভাবস্থায় হাম অথবা কলেরা রোগে আক্রান্ত হলে
- জরায়ুর টিউমার বা জরায়ুর গঠনগত কোনও ত্রুটি থাকলে
- আগের গর্ভাবস্থায় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত করানো হয়
- মায়ের শরীরে প্রোজেস্টেরোন হরমোন কম থাকার কারণে গর্ভপাত হতে পারে
- গর্ভবতী যদি প্রবল মানসিক চাপে থাকেন বা চরম শোক দুঃখ পান তাহলে গর্ভপাত হতে পারে
- গর্ভাবস্থায় পেটে আঘাত পেলে, অত্যধিক পরিশ্রম, বাস বা ট্রেনে অনেক দূরে যাতায়াত করলে গর্ভপাত হতে পারে

চিকিৎসা

- গর্ভপাত শনাক্ত করা সম্ভব হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে
- কমপক্ষে একমাস বিশ্রাম এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

গর্ভকালীন মায়ের যে ডায়াবেটিস হয়, তাকে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস বলে। ১ থেকে ৩ শতাংশ মহিলার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সাধারণত সন্তান জন্মদানের পর সেরে যায়। কিন্তু পরবর্তিতে মায়ের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়। প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল থেকে উৎপন্ন কয়েক ধরণের হরমোনের কারণে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এসময় মায়ের শরীরে বিভিন্ন হরমোনের ভারসাম্যহীনতাই এই রোগের জন্য দায়ী। প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল থেকে উৎপন্ন কর্টিসল, প্রজেস্টেরন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন, প্রোল্যাকটিন, এস্ট্রাডিওল ইত্যাদি হরমোন রক্তের ইনসুলিন হরমোনকে তার কাজে বাঁধা দেয়। এতে, ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজকে শরীরের বিভিন্ন কোষে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থানান্তরিত করতে পারে না। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। এটাই গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের মূল কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী হওয়ার আগে যেসব নারীর খাদ্য তালিকায় চর্বি এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ সাধারণের তুলনায় বেশি থাকে তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

কাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হতে পারে

- যাদের প্রথম গর্ভধারণকালে বয়স ২৫ এর বেশি
- পরিবারে কারো ডায়াবেটিসের পূর্ব ইতিহাস থাকলে
- মায়ের অতিরিক্ত ওজন হলে
- আগে থেকে ডায়াবেটিস থাকলে
- মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে

লক্ষণ

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে সাধারণত তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঝাপসা দৃষ্টি, ক্লান্তি, যোনিপথ ও চামড়ার সংক্রমণ, অতিরিক্ত তৃষ্ণা, ঘন ঘন ও অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ, বমি বমি ভাব এবং বমি, ক্ষুধা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়ার মত কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকলে গর্ভপাত, গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু, প্রিএক্লাম্পশিয়া, এক্লাম্পশিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লেবারে চলে যাওয়া, গর্ভ সঞ্চারের আগে চোখ বা কিডনির সমস্যা থাকলে তা বেড়ে যেতে পারে, প্রসব পরবর্তী রক্তপাত হতে পারে, দুধ আসতে দেরী হতে পারে।

পরীক্ষা

রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করা। যদি সকালে খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ৬.১ মিলিমোল/লিটার (১১০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) বা তার চেয়ে বেশী অথবা ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পরে ৭.৮ মিলিমোল/লিটার (১৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) বা তার চেয়ে বেশী হলে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হিসেবে সনাক্ত করতে হবে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)। আরেকটি পদ্ধতি আছে, তাকে বলে GCT (Glucose Challenge Test)। সেটা হল দিনের যে কোনও সময়ে (খালি বা ভরা পেট জানা লাগবে না) ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ১ ঘণ্টা পরে ৭.৮ মিলিমোল/লিটার (১৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) বা তার চেয়ে বেশী হলে তাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হিসেবে ধরে নিতে হবে। GCT পজিটিভ হলে অবশ্যই OGTT পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসা

প্রথমেই গর্ভবতী মায়ের খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা আছে এমন মায়েদের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। যার মধ্যে তার গর্ভধারণকালের মধ্যে মোট ১০ কেজি ওজন বৃদ্ধি অনুমোদন করা যাবে অর্থাৎ প্রতি মাসে ০.৪৫ কেজি ওজন বৃদ্ধি। তার জন্য প্রত্যহ তাকে মোট খাদ্যের ৪০-৪৫% শর্করা (১৫০-২০০ গ্রাম), ১৮-২০% আমিষ (৭৪ গ্রাম) এবং চর্বি জাতীয় খাদ্য ৩০% এর কম খেতে হবে। আদর্শ খাদ্যগ্রহণ যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিতে হবে আর সমগ্র খাবারকে ৬ ভাগ করে প্রতিদিন খেতে হবে। আর প্রচুর ফল খেতে হবে। গর্ভধারণকারী মহিলার ডায়াবেটিস চিকিৎসা করতে গিয়ে কখনো তাকে মুখে খাবার ডায়াবেটিক ওষুধ দেওয়া যাবে না। তার জন্য একটাই ওষুধ ইনসুলিন। যাদের গর্ভধারণের আগে থেকেই ডায়াবেটিস ছিল এবং তারা মুখে খাবার ডায়াবেটিক ওষুধ খেয়ে ভালো ছিলেন তাদেরও ইনসুলিন শুরু করতে হবে গর্ভধারণ করার পর থেকেই। ইনসুলিন নিলে কারো কারো হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ “নিউমোনিয়া” থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালভাবে পরে সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ১৭ মে ২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

১. নিউমোনিয়ার উপসর্গ নয় কোনটি?
- ক) কাশি
- খ) শ্বাসকষ্ট
- গ) জ্বর
- ঘ) ডায়রিয়া

২. নিউমোনিয়ার কারণ নয় কোনটি?
- ক) ব্যাকটেরিয়া
- খ) ভাইরাস
- গ) ছত্রাক
- ঘ) অপারেশনের পরর্বতী সময়

৩. নিউমোনিয়া জনিত জতিলতা নয় কোনটি?
- ক) রক্তপ্রবাহে জীবাণুর সংক্রমণ
- খ) লাং এ্যাবসেস
- গ) ম্যানিনজাইটিস
- ঘ) নেফ্রটিক সিনড্রোম

৪. হিব ভ্যাকসিন কত মাস বয়সে দিতে হয়?
- ক) আট মাস
- খ) নয় মাস
- গ) এগারো মাস
- ঘ) দেড় মাস

৫. নিউমোনিয়ার প্রকোপ কখন বেড়ে যায়?
- ক) গ্রীস্মকালে
- খ) বর্ষাকালে
- গ) শীতকালে
- ঘ) শরৎকালে

৬. নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া কোন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়?
- ক) ই. কোলাই
- খ) ভিব্রিও কলেরি
- গ) নিউমোকক্কাল নিউমোনি
- ঘ) শিগেলা

৭. কাদের নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে?
- ক) গর্ভবতী মহিলা
- খ) ছোট্ট শিশু
- গ) বয়স্ক ব্যক্তি
- ঘ) তরুণ

৮. নিচের কোনটি শিশুদের নিউমোনিয়ার শ্রেণীবিভাগে পড়বে না?
- ক) খুব মারাত্বক নিউমোনিয়া
- খ) নিউমোনিয়া
- গ) নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি
- ঘ) নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া

৯. নিউমোনিয়া কোন অঙ্গের প্রদাহজনিত রোগ?
- ক) কান
- খ) হৃদপিণ্ড
- গ) ফুসফুস
- ঘ) কিডনি

১০. প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রতি এক লক্ষ শিশুর মধ্যে কত সংখ্যক শিশু নিউমোনিয়ায় মারা যায়?
- ক) ২১ হাজার
- খ) ২২ হাজার
- গ) ২৩ হাজার
- ঘ) ২৪ হাজার

দশটি লক্ষণে বুঝবেন দেহে আয়রনের অভাব ঘটেছে

অবসন্নবোধ

প্রতিদিন নানা কাজের চাপে ক্লান্তিভাব আসতে পারে। তবে তা আয়রনের অভাবের কারণে কিনা তা বোঝা কঠিন। আয়রনের অভাবে নারীরা প্রচণ্ড অবসন্ন হয়ে পড়েন। তবে নারী পুরুষ উভয়েরই আয়রনের ঘাটতি হলে দুর্বলতা, কাজে ধ্যান না দেওয়া এবং বিরক্তিবোধ ইত্যাদি ব্যাপক আকারে দেখা দিতে পারে। আয়রনের অভাবে দেহের টিস্যুতে অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না। ফলে এমন বোধ হয়।

বিবর্ণ চেহারা

আয়রনের অভাবে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হয়। ফলে রক্তের লালচে ভাবটি চলে যায়। তখন চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়। টর্চের আলোতে ঠোঁট বা কান বা দাঁতের মাড়িতে রক্তশূন্যতা চোখে পড়বে।

নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হবে

অক্সিজেনের অভাব ঘটলে নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হবে। এ ছাড়া সিঁড়ি ভেঙে উঠতে বা একটু হাঁটাহাঁটি করলে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা হবে।

হৃদযন্ত্রটি ধড়ফড় করবে

অল্প পরিশ্রমে হৃদযন্ত্র ধড়ফড় করে, হৃদস্পন্দনে শব্দ হয় বেশি ইত্যাদি। এতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ধরনের সমস্যা হয়ে দেহে আয়রনের অভাব হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

মাথাব্যাথা

আয়রনের অভাবে মস্তিষ্কেও অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। অক্সিজেনের অভাবে টিস্যুগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং রক্তবাহী শিরাগুলো স্ফীত হয়ে যায়। এর কারণে মাথাব্যাথা শুরু হয়।

চুল পড়া

আয়রনের অভাব খুব বেশি হলে এবং এ কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দিলে চুল পড়া শুরু হয়। এ সময় দেহের সব অক্সিজেন গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাজে চলে যায়। এতে চুল পড়া শুরু হয়।

নিরামিষভোজী হলে

মাংস, ডিম এবং মাছ থেকে যে আয়রন পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আয়রনের চেয়ে দুই থেকে তিন গুন বেশি কার্যকর। ঘন রঙের পাতাবহুল সবুজ এবং কালাই জাতীয় খাদ্যে আয়রন থাকে। এদের সঙ্গে ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ জাম বা আঙুরের মতো ফলের সমাহার ঘটালে সঠিক উপায়ে আয়রন গ্রহণ করা যাবে।

পায়ে ভারসাম্যহীনতা

আয়রনের অভাবে পায়ে কাঁপুনি হবে। হাটা চলাতে ভারসাম্য থাকবে না। আয়রনের পরিমাণ যতো কমবে এই সমস্যা ততো বেশি বাজে আকার ধারণ করবে।

জিহবার অদ্ভুত রঙ

আয়রনের অভাবে মায়োগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। লাল রক্তকণিকার এক ধরনের প্রোটিন জিহবার পেশি গঠনে সহায়তা করে। আর রক্তের ওই কনিকা গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান আয়রন। তাই আয়রনের অভাবে জিহবার রঙ নষ্ট হয়ে যায়।

গর্ভবতী অবস্থায়

গর্ভাবস্থাকালীন যে শিশুটি ভূমিষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে তারও আয়রন প্রয়োজন হয়। ফলে মায়ের দেহ থেকে শিশু তা গ্রহণ করে। ফলে মায়ের দেহে আয়রনের অভাব দেখা দেয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

এসিআই লিমিটেড